কষিয়ে দিল কমল। এই প্রথম। দশ বছরের বিবাহিত জীবনে এই প্রথম ঝিনুকের গায়ে হাত তুলল কমল!

(৪)

তপাইকে স্নান করানো হয়ে গিয়েছে। ও এখন ব্যালকনিতে দাদুর সঙ্গে গল্প জুড়েছে। সবিতা রান্নাঘরে। সব কিছু আন্দাজ করে ঝিনুককে আর ঘাঁটায়নি সে। ঝিনুক এখন বেডরুমে ঠায় বসে। এ ঘটনা কার সঙ্গে শেয়ার করবে ঝিনুক? মা-র সঙ্গে? মা-র বয়স হয়েছে। চিন্তা করবে। তবে কাকে বলা যায়, যাতে একটু হলেও হালকা হতে পারে ঝিনুক। কেয়াকে কি ফোন করা যায়! ও তো ঝিনুকের পুতুল খেলার বয়সের বন্ধু। ও তো বুঝবে ওর ব্যাপারটা। স্কুলে থাকতে কত কথা তো শেয়ার করেছে কেয়াকে!

অনেকদিন অবশ্য ফোনাফোনি হয়নি দু'জনের। নাম্বারটা ডায়াল করতেই সেই চিকন গলা, বাব্বা, তুই তো একদম ভুলেই গিয়েছিস!

– ভুললে কি আর ফোন করতাম?

– যাক, কেমন আছিস বল্?

– তুই কেমন আছিস বল্?

ঝিনুকের কথার উত্তরে এক মুহূর্ত না থেমে কেয়া বলল, বিন্দাস! খাচ্ছি দাচ্ছি, ঘুরে বেড়াচ্ছি বরের পকেট কাটছি আর বাচ্চা সামলাচ্ছি।

– বাঃ, খুব ভালো! বরের পকেটও কাটছিস?

– কী করব বল্, বড্ড হিসাবি। আমি অতটা পারি না। যাক, এবার তোর কথা বল্।

একটু হেসেই ফেলল ঝিনুক। সে হাসিতে কি ছিল না বুঝলেও হাসির শেষে যে দীর্ঘশ্বাস নিল ঝিনুক, তা টের পেল কেয়া।

– ভালোই তো ছিলাম ... কিন্তু ইদানীং কেমন যেন সব এলোমেলো হয়ে গেল!

– কী বলতে চাইছিস?

– বলছি, একটা বন্ধু খোঁজ ঝিনুক। সব ঠিক হয়ে যাবে। দেখবি, তোর পরিচিত গণ্ডির মধ্যেই কাউকে পেয়ে যাবি, যে তোর অনুভূতিগুলো বুঝতে পারবে।

– ইয়ার্কি মারিস না কেয়া।

– আমি ইয়ার্কি মারছি নারে। সত্যি বলছি, এখন একজন বন্ধুর খুব দরকার তোর। যে তোর কথা ভাবে না, তুই-ই বা তার কথা ভেবে ভেবে কষ্ট পাবি কেন! তা ছাড়া তুই উচ্চশিক্ষিত, একটা কাজ ঠিক জোগাড় করে নিতে পারবি, দেখবি। ... তবে তপাই ছেলেমানুষ। ওকে কষ্টটা বুঝতে দিস না।

– এ সব কোনওদিনও স্বপ্নেও ভাবিনি কেয়া। এ সব স্কুল-কলেজ লাইফে হলে বলতে পারতিস। এখন আমরা সংসারী। এ সব ভাবাও তো পাপ!

– পাপ? সংসার কি তোর একার নাকি? সে তো এ সব কিছু ভাবছে না! ... শোন, তুই ভালো থাকলে বন্ধু হিসেবে আমারও ভালো লাগবে। তাই বলা ... এই রে!

– কী হল?

– আর বলিস না? আমার ছোটছেলেটা তো এখন একা একাই পায়খানায় বসতে শিখে গিয়েছে। কিন্তু পটি করার পর জলটা সেই আমাকেই ঢেলে দিতে হয়। পটি করে দাঁড়িয়ে আছে। ডাকছে। ভালো থাকিস, বুঝলি। পরে ফোন করব।

মোবাইলটা খাটের উপর রেখে চুপ করে বসে থাকল ঝিনুক। অনেকক্ষণ। ভাবছিল কেয়ার কথাগুলো। এটা ঠিক, কমলের সঙ্গে তার সম্পর্কটা আর আগের মতো নেই। জানে

ঝিনুক ভাবছিল তপাইয়ের কথা। যদি সত্যিই একদিন তপাইকে সঙ্গে করে নিয়ে বেরিয়ে যেতে হয় এই সংসার থেকে, কীভাবে নেবে ও ব্যাপারটাকে? প্রথম প্রথম খুব কষ্ট পাবে নিশ্চয়। তারপর ধীরে ধীরে সব সয়ে যাবে

– কেন, কী হল? শুনেছি তো শাশুড়ি নেই। ননদও নেই ...

– মিনষে তো আছে।

হেসে ফেলল কেয়া।

– কি বললি, 'মিনষে'? তা তোর 'মিনষে' আবার কি করল?

– প্রেম। ... উনি আবার প্রেমে পড়েছেন।

– ধ্যাত, কমলদা! এটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে।

– হলেও বলি, এটাই সত্যি। আর তারপর ...

– তারপর কী?

– না, থাক।

– আপত্তি থাকলে বলিস না।

– না, তা ঠিক না। কী আর বলব বল্, শেষটায় গায়েও হাত তুলল কমল!

– এ মা, তাই!

– হ্যাঁ। আজ।

বিস্তারিত জানার পর কেয়া সহানুভূতির সুরে বলল, 'আরে, তাতে তুই এত আপসেট হয়ে পড়ছিস কেন বলতো! একটা 'টি-টোয়েন্টি' তুইও খেল না!'

– মানে?

– মানে আবার কি, এখন দিনকাল অনেক বদলে গিয়েছে। সব জেনেশুনেও কাঁচুমাচু হয়ে ঘরের কোণে বসে থেকে আসন সেলাইয়ের দিন নেই আর। ওকেও বুঝতে দে না কতটা কষ্ট তুই পেয়েছিস। একা একা কেন গুমরে মরবি! তোরও তো একটা জীবন আছে। পছন্দ-অপছন্দ, ভালোলাগা-মন্দলাগা আছে!

কমলও। এ ভাবে সম্পর্ক টেকেও না। সত্যিই তো, সংসার তো তার একার নয়, কমলেরও। কী হবে এই মিথ্যে সম্পর্কটা আগলে রেখে! লোক দেখানো 'বরবউ' সেজে!

ঝিনুক ভাবছিল তপাইয়ের কথা। যদি সত্যিই একদিন তপাইকে সঙ্গে করে নিয়ে বেরিয়ে যেতে হয় এই সংসার থেকে, কীভাবে নেবে ও ব্যাপারটাকে? প্রথম প্রথম খুব কষ্ট পাবে নিশ্চয়। তারপর ধীরে ধীরে সব সয়ে যাবে।

– বউমা, দাদুভাইকে খাইয়ে দাও। ওর পেটে কিছু নেই।

পিছন ঘুরে ঝিনুক দেখল শ্বশুরমশাই দাঁড়িয়ে। শুধু তো তপাই নয়, এই লোকটির কথাও তো তার ভাবা দরকার। বয়স হয়েছে তাঁর। হার্টের পেশেন্ট। তিনি তো কোনও দিনও খারাপ ব্যবহার করেননি! নিজের মেয়ের মতোই দেখেছেন এতকাল। আজও। তপাইকে তার কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলে তিনি কী করে বাঁচবেন? তিনি তো একা!

– ও, বউমা, আজ কমল এলে আমি একবার তোমাদের সঙ্গে বসব, বুঝলে!

ঝিনুককে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই শুভেন্দুবাবু ধীরে ধীরে তাঁর শোওয়ার ঘরের দিকে পা বাড়ালেন।

শ্বশুরমশাইয়ের চলে যাওয়ার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ঝিনুক। ঋজুদেহ মানুষটাকে আজ কেমন ঝুঁকে চলতে দেখল সে!

(অঙ্কন-অভি)

অণুগল্প

আন্ডার কনস্ট্রাকশন

অমল কৃষ্ণ রায়

আমার বন্ধু নিলয়। ও আজও আন্ডার কনস্ট্রাকশন বাড়ি দেখলেই ভয় পায়। সে ভয়টা অবশ্য সঙ্গত কারণেই। নিলয়ের জীবনের প্রথম প্রেম। সুযোগটা অপ্রত্যাশিতভাবেই এসেছিল। সেদিন ছিল সরস্বতী পুজোর দিন। অপটু হাতে শাড়ির কুচি সামলাতে সামলাতে মিষ্টি দেখতে রোগা ধরনের টিকালো নাকের সুন্দরী মৌলি আপনমনে হেঁটে যাচ্ছে। মৌলির পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে দ্বাদশ শ্রেণির নিলয় রাস্তার চারপাশটা একবার দেখে নিয়ে সুনসান বুঝতে পেরে মৌলিকে সাহসে ভর করে বলেছিল, তোকে বেশ লাগছে কিন্তু মৌলি। শুনে মুচকি হেসেছিল মৌলি। বাঁ গালে ছোট্ট টোল পড়া হাসিটার মধ্যে ছিল খুশির জোয়ার। 'ভালো লাগছে' শব্দবন্ধটি মৌলিকে সেদিন বেশ নাড়িয়ে দিয়েছিল। জীবনের প্রথম কোনও পাড়াতুতো দাদার এই প্রশংসাবাক্য শুনে মৌলির ভিতরে তখন খুশির ঢেউ বইছিল। নিলয়ও বুঝে নিয়েছিল কথাটা মৌলির বেশ মনে ধরেছে।

সুযোগ বুঝে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে একটু মিষ্টি আলাপন। তারপর সন্ধেবেলায় বেরোনোর আমন্ত্রণ। গোধূলির আঁধার যখন শহরের অলিগলি ছেয়ে ফেলতে লাগল, তখন কোনও একটা গলিতে আন্ডার কনস্ট্রাকশন বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে সাহসে ভর করে বলে ফেলা – চল ওই বাড়িটার আড়ালে গিয়ে একটু নিরিবিলি বসি। মৌলি সে প্রস্তাবটাও মেনে নিয়েছিল। অন্ধকারে সেদিন দু'জনে সে বাড়ির ভিতরে হারিয়ে গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে নিলয় যখন মৌলির ঠোঁটে প্রথম ঠোঁট মেলাবে বলে তৈরি হচ্ছিল তখনই বিপত্তি। একটা ভারী গলা অন্ধকার থেকে ভেসে এল, 'এই, কী করছিস তোরা?'

নিলয় হকচকিয়ে উঠেছিল। কারণ, লোকটি মৌলির বাবা এবং এলাকার জাঁদরেল ঠিকাদার মণি চাকলাদার। ভয়ে কয়েক পা পিছনে সরে এসেছিল সে। মৌলি বলে উঠল, 'বাবা তুমি এখানে?'

লোকটি বলল, হ্যাঁ এই বাড়িটার প্রোমোটারি তো আমিই করছি। তা তুই এই হতচ্ছাড়াটাকে নিয়ে এখানে কেন এলি?

কারও মুখে কোন উত্তর নেই। মৌলির বাবা সেদিন নিলয়কে কান ধরে পঞ্চাশবার ওঠবস করিয়ে তাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়েছিল, তার মেয়ের সঙ্গে আর কোনওরকম সংস্রব রাখবে না। নিলয় কথা রেখেছিল। মৌলির সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক রাখেনি। মনমরা হয়ে নিলয় যখন শহরের রাস্তায় উদ্দেশ্যহীনভাবে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায় তখন একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, কীরে তোর প্রেমটেমের কী খবর? নিলয় ভারাক্রান্ত মনে উত্তর দেয়, 'ওটা এখনও আন্ডার কনস্ট্রাকশন।'

পরিণতি

শুভদীপ রায়

শহরের অদূরে এক অনামী বৃদ্ধাশ্রমের ঘরের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ সমরেশবাবু, বয়স হয়েছে! বাইরে আর বেশিক্ষণ হাঁটাচলা করতে পারেন না, জানালার ধারে বসে বসে প্রকৃতির নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনাগুলি দেখে দিন কাটে। কী সুন্দর ভরা সংসার ছিল একসময়। স্ত্রী সুনন্দা, ছেলে শশাঙ্ক, পুত্রবধূ, নাতি-নাতনি। কিন্তু সুনন্দা চলে যাওয়ার পর ছেলে-বউমা বোধহয় তাঁর অস্তিত্বও সহ্য করতে পারল না। কথায় কথায় অপমান, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা আরও কত কী! শেষমেষ ছেলে একদিন ভুলিয়ে ভালিয়ে এই বৃদ্ধাশ্রমে ফেলে রেখে গেল। এখন শুধু পুরোনো সব স্মৃতি আর চোখের জল একমাত্র সঙ্গী। তাও পুরোনো সব কথা ঠিকঠাক মনে পড়ে না। এভাবেই দিনগুলো কেটে যায়।

আস্তে আস্তে কেটে গিয়েছে পঁচিশটা বছর। শহরের অদূরে বৃদ্ধাশ্রমের সেই ঘরটিতে এখন সমরেশবাবু নেই। আর নেই তার স্মৃতিগুলোও। ঘরের সেই জানলাটির কাছে এসে দাঁড়ান বৃদ্ধ শশাঙ্কবাবু। মনে তাঁর এখন অনেক প্রশ্ন।

অঙ্কন ঃ শংকর বসাক